অধ্যায় ৫ ঃ বনফুল — 'জাগ্রত দেবতা'

অধ্যায়-বিন্যাস

৫.১ পরিচিতি

৫.২ জ্ঞাতব্য বিষয়

৫.৩ বনফুলের জীবন ও সাহিত্য

৫.৪ জাগ্রত দেবতা

৫.৪.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

৫.৪.২ গল্প-বিশ্লেষণ

৫.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৫.৬ অতিরিক্ত পঠন

৫.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

৫.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বনফুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতে পারবেন, বনফুলের সাহিত্য সম্পর্কে জানবেন
- কবি বনফুল কীভাবে গল্পকার হয়ে উঠলেন, সেকথা জানতে পারবেন
- পারিবারিক ও সামাজিক কোন প্রেক্ষাপটে বনফুলের লেখক সত্তা বিকশিত হয়েছিল তা জানতে পারবেন
- বনফুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়ে জানবেন
- 'জাগ্রত দেবতা' গল্পে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী লেখকের কলমে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ পাবেন
- গ্রাম বাংলার উৎসব আয়োজন সম্পর্কে জানবেন
- বনফুলের গল্প বলার চমৎকারিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

৫.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়ে বনফুলের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, তাঁর জীবনের নানা ওঠাপড়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বনফুলের বড় হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ও তাঁর জীবনকালের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাক্রমের উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে। এসব জানা থাকলে বনফুলের লেখালিখি বিশ্লেষণে আপনাদের সুবিধা হবে। কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করে বনফুল কীভাবে গল্পকার হয়ে উঠলেন সে বিষয়েও

জানতে পারবেন আপনারা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক লেখা — সাহিত্যের নানা শাখায় বনফুলের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে। লেখকের জীবনে সমকালীন অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকদের পরিচয় ও প্রভাবের দিকটিও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। লেখকের জীবনের নানা মজার ঘটনার উল্লেখ আপনাদের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠতে পারে।

এই অধ্যায়ে আপনারা বনফুলের একটি গল্পও পড়বেন। গল্পগুলি যে বইটি থেকে নেওয়া তার নাম *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*। বইটির ভূমিকা লিখেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য। ১৩৫৫ সনে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে রয়েছে 'জাগ্রত দেবতা' নামক গল্পেটির মূল পাঠ ও আলোচনা। 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটি লেখক সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন।

৫.৩ বনফুলের জীবন ও সাহিত্য

বনফুলের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই তারিখে। তাঁর জীবনকাল প্রায় ৮০ বছর। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। দীর্ঘ জীবনে তাঁর রচিত সাহিত্যের তালিকাটিও বেশ লম্বা, তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। নাটক লিখেছেন ১৫ টি। কবিতার সংখ্যা তিনশোরও বেশি। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনও রয়েছে তাঁর। রয়েছে আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ গ্রন্থও। অবশ্য বনফুলের অন্যতম পরিচয় গল্পকার হিসেবেই। পরের অধ্যায় দুটিতে আপনারা তাঁর কয়েকটি গল্প পড়বেন। এখানে কেবল জেনে রাখুন বনফুলের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। বনফুলের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, — বাংলা সাহিত্যে অতি ক্ষুদ্র গল্প ও সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হয়েছে তাঁরই কলমে।

'বনফুল' আসলে লেখকের ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বলাইচাঁদের ছদ্মনাম নেওয়ার পিছনে এক মজার গল্প আছে। সে গল্প একটু পরে বলছি। আমরা তাঁকে 'বনফুল' বলেই উল্লেখ করব। বনফুলের বাবার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। মা মৃণালিনী দেবী। সত্যচরণ পেশায় ছিলেন ডাক্তার। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল হুগলি জেলার শেয়াখালা গ্রামে। সেখানে তাঁরা 'কাঁটাবুনে মুখুজ্জে' নামে পরিচিত ছিলেন। বনফুলের ঠাকুমা যখন মারা যান, সত্যচরণ তখন খুবই ছোট। ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ায় সত্যচরণ সাহেবগঞ্জের মামাবাড়িতেই প্রতিপালিত হন। পড়াশোনাও সেখানেই। পরবর্তীকালে ডাক্তারি পাশ করার পর সত্যচরণ বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে চলে যান ডাক্তারি করতে। বিহারের এই মণিহারী গ্রামেই বনফুলের জন্ম। গঙ্গা নদী এবং কোশী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই মণিহারী গ্রাম। নদী, পাহাড়ও জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রামের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হতে থাকেন বলাইচাঁদ।

বনফুলের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপটটি খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছিল। যেকোনো মানুষের কিশোর বয়েসের স্মৃতি পরিণত বয়সে বারবার ঘুরেফিরে আসে। আগেই বলেছি বনফুলের বাবা ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ছিল বিশাল ***একান্নবর্তী পরিবার***।



একান্নবর্তী পরিবার ঃ যে পরিবারের সদস্যরা একই অন্নে প্রতিপালিত হন। অর্থাৎ যৌথ পরিবার। একসময় গ্রামীণ বাংলায় অধিকাংশ পরিবারই একান্নবর্তী ছিল। কর্মব্যস্ততা, নাগরিকতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের বিকাশেয় সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার ভাঙতে আরম্ভ করে।

সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ হ'লেও তিনি রক্ষণশীল ছিলেন না। বনফুলদের বাড়িতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশ্রিত আত্মীয় কুটুম, পরিচিত অপরিচিতের ভিড় লেগেই থাকত। সত্যচরণ ছিলেন সংস্কারমুক্ত, বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। নিজের থিয়েটারের দল ছিল তাঁর। বেশির ভাগ সময় সেই থিয়েটারের দলের লোকেদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হত সত্যচরণের বাড়িতে। বাড়ির পাশেই ছিল রেল স্টেশন। তাঁর বাড়িতে একবেলা খেয়ে ট্রেন ধরতেন পরিচিতরা। গঙ্গা স্নানে পুণ্য সঞ্চয়ে যাঁরা আসতেন তাঁদেরও ভিড় জমত সত্যচরণের বাড়িতে। ওই অঞ্চলে কোনো হোটেল বা ডাকবাংলো না থাকায়, গভর্নমেণ্ট অফিসারেরা আতিথ্য নিতেন মাঝেমধ্যেই। এমনই অসংখ্য মানুষের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন বনফুল। শুধু মানুষই নয়, সত্যচরণের গৃহপালিত পশু পাখির সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। অনেকগুলি গরু, কয়েকটি কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ, দুটি বড় জাতের পাহাড়ি ঘোড়া এবং প্রচুর পাখি পুষতেন সত্যচরণ। *সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী* ইত্যাদি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। খুব সহজেই বোঝা যায় উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিচিত্রতর মানুষের সান্নিধ্য, এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি পারিবারিক অনুরাগ বনফুলের মন ও মানসিকতায় একটা গঠনমূলক ছাপ ফেলেছিল।

বনফুলের কিশোর মনে পরিবারের আরো দুজন মানুষ গভীর প্রভাব ফেলেছিল— মা মৃণালিনী দেবী এবং কাকা চারুচন্দ্র। মৃণালিনী ছিলেন নির্লোভ, ধার্মিক, নিঃস্বার্থ এবং তেজস্বিনী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে তিনি তবু স্বামীর জাতিধর্মভেদহীন উদারতাকে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার খাতিরে শিশু বলাইচাঁদকে তিনি মুসলমানীর বুকের দুধ খাওয়াতে সম্মত হয়েছিলেন। নিজের হাতে রুগ্ন ছেলেকে মুরগির মাংস রান্না করে দিয়েছেন ডাক্তারি মতে। আবার একই সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধও হয়েছেন।

বনফুলের কাকা চারুচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। সত্যচরণের বিপরীতে তিনি ছিলেন গোঁড়া ও ছুঁৎমার্গী। অথচ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত গ্রামে মাইনর ক্লাসের জন্য স্কুলবাড়ি তৈরি করে দেন। চারুচন্দ্র ছিলেন সেই স্কুলের হেডমাষ্টার। কাকার স্কুলে দেড় বছরের ছোট ভাই ভোলার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হন বলাইচাঁদ। তখন তার বয়স নয় বছর। এই স্কুলেই বনফুলের সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি। একদিন ভোলা একটা আস্ত কবিতা লিখে অবাক করে দেয় সবাইকে। ভোলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বলাইচাঁদ লেখেন 'ময়ূর' নামের একটি কবিতা। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ***পয়ার ছন্দে***। বনফুলের লেখা এই প্রথম কবিতাটি কেমন ছিল, আমাদের তা জানার উপায় নেই। বনফুলের জীবনীতে এই কবিতাটির কথা রয়েছে। কিন্তু কবিতাটি রক্ষিত হয়নি। মাইনর ক্লাসের পরীক্ষায় পূর্ণিয়া জেলায় প্রথম হন বলাইচাঁদ।



পয়ার ছন্দ ঃ চোদ্দ অক্ষরের মিত্রাক্ষৰ ছন্দ। বাংলা কবিতা গোড়া থেকেই এই ছন্দের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। বাংলা মহাভারত এই ছন্দে লেখা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ছন্দে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে।

মাইনর ক্লাসের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাশ করার পর বলাইচাঁদ ভর্তি হলেন সহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলে। গঙ্গার এপারে মণিহারী ওপারে সাহেবগঞ্জ। যাতায়াত করতেন স্টিমারে চেপে। ১৯৬৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলাইচাঁদ তখন ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। যুদ্ধের জন্য বন্ধ হয়ে গেল স্টিমার চলাচল। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াল নৌকা। বাড়ি ও হস্টেলে

যাতায়াতের পথে গঙ্গার বুকে এই জলযাত্রা প্রাণভরে উপভোগ করতেন বলাইচাঁদ।

সাহেবগঞ্জ স্কুলে এসে পড়াশোনায় বলাইচাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণই থাকল। এই স্কুলে তিনি যতদিন পড়েছেন, বরাবর প্রথম হয়েছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখির প্রতি উৎসাহ এই পর্বে প্রবল হয়ে উঠল। এখন তিনি সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংয়ের আবাসিক ছাত্র। ঠিক করলেন হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। নাম দিলেন— 'বিকাশ'। এই পত্রিকার প্রায় সমস্ত লেখার পিছনে ছিলেন বলাইচাঁদ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য একাধারে সব লেখাই লিখতেন তিনি। 'বিকাশ'-এর একজন গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন জনৈক বটুকদা। এই বটুকদার উৎসাহে ১৯৬৫ সালে কলকাতার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় বলাইচাঁদের স্বনামে ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় সবাই খুশি হলেন, কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না হেডপণ্ডিত মশাই। তাঁর মতে অল্প বয়সে সাহিত্যের নেশা মাথায় চাপলে পড়াশোনা গোল্লায় যাবে। 'মালঞ্চ'-তে কবিতা ছাপা হওয়ার হেডপণ্ডিতের তিরস্কার জুটল বলাইচাঁদের কপালে। নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন বলাইচাঁদ। বটুকদা এগিয়ে এসে ছদ্মনাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। বলাইচাঁদের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।



আপনাদের করণীয় — ৫.১

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন—

(ক) বনফুলের জীবনে কাকা চারুচন্দ্রের প্রভাবের দিকটি আলোচনা করুন।

(খ) পারিবারিক পরিমণ্ডল বনফুলের সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে —আলোচনা করুন।

(গ) ছদ্মনাম নেওয়ার সময় বলাইচাঁদ কেন 'বনফুল' শব্দটিকে বেছে নেন— আলোচনা করুন।

'বনফুল' ছদ্মনাম নিলেন বলাইচাঁদ। গ্রামের পরিবেশে বড় হওয়া বলাইচাঁদের কাছে বন ও ফুল এই দুইয়েরই প্রভাব ছিল খুব। বলাইচাঁদের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, একবার একা একা চলে গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের পীরবাবার জঙ্গলে। আত্মজীবনীতে বলাইচাঁদ তার ছদ্মনাম গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দর করে লিখেছেন— 'ছেলেবেলার ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল জংলীবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোওবাসি। বাল্যকালে অনেক কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পিছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য নিকেতন। এইজন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।' (*পশ্চাৎপট*, পৃঃ ৪৪)। বনফুল ছদ্মনামে বলাইচাঁদের প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হল ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। কুচবিহারের রানি নিরূপমা সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কবিতাটির নামছিল 'উষা'। পরের বছর ওই একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বনফুলের আরো দুটি

কবিতা, 'দুর্বা' ও 'প্রদীপ'। সেসময় বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির ভিতর সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকা। এই পর্বে বনফুল সেখানেও বেশ কিছু কবিতা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সবকয়টি কবিতাই অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে। কিশোর বনফুল কিন্তু মনোবল হারালেন না। কবিতা লেখা এবং প্রকাশের জন্য পাঠানো চলতে থাকল সমান উৎসাহে।

১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন বনফুল। এবার তাঁকে সাহেবগঞ্জ ছাড়তে হল পরবর্তী পড়াশোনার জন্য। সাহেবগঞ্জ ছেড়ে হাজারীবাগের সেণ্ট কলম্‌বাস কলেজে ভর্তি হলেন আই এস সি পড়ার জন্য। কিন্তু সাহেবগঞ্জ তাঁর জীবনে দাগ কেটে রইল। সাহেবগঞ্জের বোর্ডিং, বটুকদা, নীলকুঠি, ঝর্ণা, পাহাড়তলী ইত্যাদি বনফুলের কিশোর বয়সের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রইল।

হাজারীবাগের চারদিকে অরণ্য আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই পরিবেশ উপভোগ করতেন বলাইচাঁদ। কলেজের মিশনারি অধ্যাপকদের খ্রিষ্টীয় পরিমণ্ডল বলাইচাঁদের ভাবনা ও কল্পনার জগতে নতুন রং লাগাল। ছোটবেলা থেকে বই পড়ায় প্রবল আগ্রহছিল বনফুলের। সাহেবগঞ্জে থাকাকালীনই বলাইচাঁদের মাতৃভাষার সেরা সাহিত্যগুলি পড়া হয়ে গিয়েছিল। ওই পর্বেই পড়েছিলেন ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যিকের সাহিত্য। হাজারীবাগে এসে বই পড়ার পরিধিটা আরও অনেক বড় হয়ে গেল। ***সেক্সপিয়র,*** মিল্টন, হুগো, টলস্টয় প্রমুখের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে হাজরীবাগ লাইব্রেরির সুবাদে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাহেবগঞ্জে থাকাকালীন একবার সেসময়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কবিতা পঠিয়েছিলেন বলাইচাঁদ। ছাপা হয়নি। অবশ্য হাজারীবাগের কলেজজীবনের শেষ দিকে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রতিষ্ঠা আসে সেই 'প্রবাসী' পত্রিকার হাত ধরেই। ১৯২০ সালে পরপর দুমাসে *প্রবাসী*র পাতায় বনফুলের দুটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতাদুটির নাম যথাক্রমে 'নাছোড়বান্দা' ও 'সুবুদ্ধি'। দুটিই সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ।



সেক্সপিয়র ঃ ইংরেজি সাহিত্যের মহান কবি ও নাট্যকার। জন্ম-১৫৬৪, মৃত্যু-১৬১৬। ওথেলো, ম্যাকবেধ, কিংলিয়র, জুলিয়াস সিজার ইত্যাদি তাঁর অতি বিখ্যাত নাটকগুলির অন্যতম।

১৯২০ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ডাক্তারি পড়ার জন্য বনফুল কলকাতা যান। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বনফুল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। বর্ণনাটি চিত্তাকর্ষক— প্রথম দিন আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি এবং তালিমারা জুতো পরে কলেজে উপস্থিত হলে কলেজের সুবেশ কেতাদুরস্ত দারোয়ান প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা না করিয়ে তাঁকে বসিয়ে রাখেন। প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর ভাগ্যক্রমে বনফুলের দেখা হয় অনাদিবাবু নামে জনৈক পূর্বপরিচিতের সঙ্গে। অনাদিবাবু তখন সেখান থেকে বনফুলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, নাপিত ডাকিয়ে 'দশআনা-ছয়আনা' চুল কাটিয়ে, শহুরে পোশাকে বনফুলকে আবার কলেজে নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজের সে সময়ের অধ্যক্ষ হাজারীবাগ কলেজের অধ্যক্ষের বাল্যবন্ধু ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বনফুলের ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। হাজারীবাগ কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব বনফুলের দরখাস্তের উপর প্রশংসাসূচক কয়েকটি কথা লিখে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় প্রথম দিকে বনফুল কিছুদিন শেওড়াফুলির মামা বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত করতেন। সেসময়ে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল না। বনফুল প্রথমে তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে, পরে কলেজের কাছে ইণ্টারন্যাশনাল

বোর্ডিং এবং তার পরে বৌবাজারের ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়াশোনা করতেন।

মণিহারী থেকে সাহেবগঞ্জ, তারপর হাজারীবাগ হয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস— এভাবেই অভিজ্ঞতা বাড়ছিল বনফুলের। সেইসঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছিল সাহিত্যিক হিসাবে তার সুনামও। কলকাতা বাসের প্রথম দুবছর বনফুল মূলত কবিতা, বিশেষ করে ***ব্যঙ্গকবিতাই*** রচনা করেছেন। অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে এই পর্বে বনফুলের কবিতা ছাপা হয় 'ভারতী' ও 'কল্লোল'-এর মতো সমৃদ্ধ পত্রিকাতেও। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের।



আসুন জেনে নিই...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি। 'ছন্দের জাদুকর' বিশেষণে প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ১৯২২ সালের ২৫ জুন। ইনি অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা'। 'তীর্থসলিল', 'অভ্র-আবীর', 'কুহু ও কেকা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতায় বাংলা ছন্দের বিভিন্ন প্রয়োগ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

১৮৯৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত বনফুলের জীবনের এই পর্বটিতে আমরা দেখলাম একটি শিশু যৌথ পরিবারে জন্মে প্রাকৃতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, গ্রাম থেকে এসে পৌছচ্ছে শহরে, স্কুল কলেজের পড়াশোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার সাহিত্য পাঠের জগৎ এবং সেই শিশু ধীরে ধীরে কবি হয়ে উঠছেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত বনফুলের সাহিত্যিক পরিচয় মূলত কবির পরিচয়। ১৯২২-এ এসে বনফুলের সাহিত্যিক পরিচয়ে অন্য একটি ধারা যুক্ত হবে— গল্পকারের পরিচয়।

কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎই গল্প লিখতে আরম্ভ করেন বনফুল। গল্প লেখার শুরুর বিষয়ে বনফুল তাঁর ***আত্মজীবনী*** 'পশ্চাৎপট'-এ লিখেছেন— "মেডিক্যাল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাসরুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারীতে বসিয়া থাকিতে খুব ভাল লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিক্যাল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়তি-মাশুল', 'অজান্তে' প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? 'প্রবাসী'তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম।" আত্মজীবনীতে বনফুল গল্পগুলির নাম উল্লেখ করেছেন বটে, আসলে কোনো নামকরণ ছাড়াই তিনি গল্পগুলি পাঠিয়েছিলেন 'প্রবাসী'তে। গল্পগুলির নাম পত্রিকা সম্পাদকের দেওয়া। সে যা হোক, ছাপার অক্ষরে বনফুলের প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র আশ্বিন ১৩২৯, ৬ষ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যায়। গল্পটির নাম ছিল— 'চোখ গেল'। অবশিষ্ট গল্পগুলি পরের মাস থেকে পরপর প্রকাশিত হয় ওই একই পত্রিকায় 'বাড়তি-মাশুল', 'আত্মপর' ও 'অজান্তে' নামে।

বনফুল ছিলেন চির-কৌতূহলী। গ্রামের সহজ সরল অথচ গভীর জীবনবোধ নিয়ে

ব্যঙ্গকবিতা ঃ পরিহাসপ্রবণ কবিতা, কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি উপহাসই এধরনের কবিতা রচনার মূল উদ্দেশ্য। প্রধানত এই কবিতাগুলি সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হত।

আত্মজীবনী ঃ নিজ জীবনবৃত্তান্ত। এই ধরনের লেখায় কেন্দ্রীয় চরিত্র লেখক নিজেই। কোনো আড়াল না রেখে নিজের জীবনকাহিনি পাঠকের সামনে মেলে ধরার কাজটি অত্যন্ত কঠিন, তবু সব দেশে সব যুগেই আত্মজীবনী লিখেছেন বিশিষ্টজনেরা।

তিনি ব্যস্ত নগরকে দেখেছেন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে। আত্মজীবনীতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন— 'আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম'। শুরুতে কিছুদিন রেল-এ যাতায়াত ও পরে কলকাতার পথে পথে নাগরিক জীবনকে নতুন চোখে তিনি যেভাবে আবিষ্কার করেন; বোধহয় তার ভিতরেই লুকিয়ে ছিল তাঁর গল্পকার হয়ে ওঠার বীজ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ বনফুল-এর প্রকৃত নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ বনফুলের বাবার নাম কী? তাঁর পেশা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বনফুলের প্রকাশিত হাতে লেখা পত্রিকাটির নাম কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বনফুলকে ছদ্মনাম নেওয়ার পরামর্শ কে দেন?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ছাপার অক্ষরে বনফুলের প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্পের নাম কী? কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল?

.....

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার শেষদিকে বনফুলের সঙ্গে পরিচয় হয় 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের। তখনও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত পত্রিকাটির সঙ্গে ভালেকরে পরিচয় ছিল না বনফুলের। হঠাৎই একদিন 'প্রবাসী'-র দপ্তরে সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই সজনীকান্ত দাসই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বনফুলের সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম প্রেরণা। সজনীকান্তের অনুরোধেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয় বনফুলের প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ***করুণ রস***'। অবশ্য লেখাটি ছাপা হয়েছিল বনফুলের নাম-স্বাক্ষর ছাড়া।

১৯২৬ সালে বিহার সরকার পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করে। বিহারের যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিলেন, তাঁদের পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়। সরকারী নির্দেশ মর্মে বনফুলকেও চলে যেতে হল পাটনায়। এম বি বি এস-এর শেষ পরীক্ষা তিনি সেখান থেকেই দেন। সেদিক দিয়ে বনফুল পাটনা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পরীক্ষার্থীদলের স্নাতকদের একজন। সেসময় পাটনা মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব প্রসূতি বিভাগ না থাকায় বিহার সরকার ব্যাঙ্গালোরের ভিক্টোরিয়া হাস্পাতালে ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে। সে সূত্রে এক মাসে দক্ষিণ ভারতে বসবাসের অভিজ্ঞতাও হয় বনফুলের। বাঙ্গালোরে থাকাকালীন স্কটল্যাণ্ডবাসী এক নার্সের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় বনফুলের। অবশ্য সে অন্তরঙ্গতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

বাঙ্গালোর থেকে ফেরার কিছুদিন পরই ১৯২৭ সালের জুন মাসে চিন সীমান্তের কাছাকাছি



করুণ রস ঃ শোক নামক স্থায়ী ভাব থেকে করুণ রসের জন্ম হয়। শৃঙ্গার ও হাস্য রস করুণ রসের বিরোধী। বাংলা সাহিত্যে করুণ রসের প্রাধান্য বেশি।

মিচিনা শহর নিবাসী উকিল গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে লীলাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয় বনফুলের। বিয়ের পরপরই ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা এবং ওই একই বছর ডাক্তারির ডিগ্রি লাভ করেন বনফুল। কিছুদিন পরই পাটনা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র হাউস সার্জেন হিসাবে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার আত্মসম্মানহানিকর প্রথা মেনে নিতে না পারায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং নিতে আরম্ভ করেন। ভালো চাকরি ছেড়ে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিসকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তের পিছনে বনফুলের একটি কারণ ছিল। আত্মজীবনীতে এপ্রসঙ্গে বনফুল লিখেছেন— 'আমি সাহিত্যচর্চা করতে চাই। ল্যাবরেটারী প্র্যাকটিস করলে তারজন্য সময় পাব। চাকরী করলে তা পাব না। জেনারেল প্র্যাকটিস করলেও তা সম্ভব নয়।' —বনফুলের এই সিদ্ধান্ত থেকে সাহিত্যসাধনায় তাঁর ইচ্ছার তীব্রতা বুঝে নিতে আপনাদের নিশ্চয় অসুবিধা হবে না।

প্যাথলজি শিক্ষা গ্রহণের একবছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে তিনি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাটানোর পর রাতে শুতে আসতেন তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে। এ-সময় স্ত্রী লীলাবতী দেবী আই-এ পড়ারজন্য বেথুন কলেজের হোস্টেলে থাকতেন। নতুন বিবাহিত জীবন ও নতুন পড়াশোনার চাপে এই সময় বনফুলের সাহিত্য সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বনফুল নিজেও জানিয়েছেন— 'আমার সাহিত্যেও একটা নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেল। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম। পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না, কিন্তু যে সাহিত্য আমি রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত হয় এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত।' একথা ঠিক যে ওই একবছর বনফুল কেবল প্রেমপত্র এবং প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। তবে সাহিত্যচর্চার বিরতি এই পর্বে এক বছরের নয়। পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর বনফুল প্রায় কিছুই লেখেননি। এর কোনো প্রত্যক্ষ কারণ জানা যায় না। কোনো এক অজানা কারণে তিনি সাহিত্য রচনার সহজ প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

প্যাথোলজি শিক্ষা শেষ করে ১৯২৯ সাল নাগাদ মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের মিউনিসিপালিটি হাস্পাতালে চলে যান বনফুল। আজিমগঞ্জে ছিলেন এক বছর। এখানে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। আজিমগঞ্জবাসের স্মৃতিতে পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেন 'নির্মোক' উপন্যাস। একবছর সেখানে থাকার পড় তিনি ভাগলপুরে চলে আসেন। স্বাধীন জীবিকা ও স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরের খলিফাবাগ-এ নিজের প্রথম ল্যাবরেটরি স্থাপন করলেন। ল্যাবরেটরির নাম দিলেন— 'The Sero Baetro clinic'.

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ বনফুলের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো লেখালিখিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। সংসার ও জীবিকা এই দুইয়েতেই এই ছবছর ব্যস্ত থাকলেন তিনি। অনেক বিখ্যাত লেখকের জীবনেই সৃষ্টিকর্মে এ-ধরনের খরার কাল লক্ষ্য করা যায়। কেন এমন হয়, তার কোনো

যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। তবে দেখা যায় 'খরা' কেটে যাওয়ার পর লেখকেরা পূর্ণ উদ্যমে ফিরে আসেন লেখালিখিতে। বনফুলের জীবনেও তেমনটাই ঘটেছিল। ১৯৩৩ সালে পরিমল গোস্বামী বনফুলের ভাগলপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। পরিমলবাবুর উদ্দেশ্য ছিল লেখককে তাঁর নিজস্ব অজ্ঞাতবাস থেকে টেনে বার করে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ফিরিয়ে আনা। পরিমল গোস্বামী সেসময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকার প্রয়োজনে লেখক বনফুলের হাতে পুনরায় কলম ধরিয়ে দেওয়া সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল হয়ত। সুসংবাদ এই যে, পরিমল গোস্বামী তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। বনফুল আবার ফিরে আসেন লেখালিখিতে। শুরু হল বনফুলের সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৩৪০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'-তে 'ভাদুড়ি' ও 'আশাহত' নামে দুটি কবিতা ছাপা হল। অজস্র ধারায় লিখতে লাগলেন গল্প, কবিতা। 'শনিবারের চিঠি'র জন্য লেখা এই রচনার অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক।

১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। ভেঙে গেল বনফুলের নিজস্ব ল্যাবরেটরি। যন্ত্রপাতি কিছু রক্ষা পেয়েছিল, তাই নিয়ে ভগলপুরে একটি অস্থায়ী ল্যাবরেটরি বানালেন বনফুল। বিপর্যয়ের এই সময় নিজে ভাগলপুরে থাকলেও একরকম বাধ্য হয়েই পরিবারকে পাঠিয়ে দিলেন মণিহারীর বাড়িতেই কিন্তু বিপর্যয়েই তো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় মেলে। বিপদে মানুষই মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। বনফুল পাশে পেলেন পটলবাবুকে। পেশায় আইনজীবী, কংগ্রেসকর্মী পটলবাবু বনফুলের সাহিত্যিক খ্যাতির সুবাদে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মূলত পটলবাবুরই ব্যবস্থাপনায় বাসযোগ্য বাড়ি ও ল্যাবরেটরি পেলেন বনফুল। মণিহারীর বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনলেন স্ত্রী ও ভাইকে। ল্যাবরেটরির পরিবেশ অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল বনফুলের। রাত নটা পর্যন্ত সেখানেই থাকতেন তিনি। পেশাগত লাভের জন্য দিনের দীর্ঘ সময় তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটাতেন, তেমনটা কিন্তু নয়। বরং পেশার তুলনায় সাহিত্যচর্চাই চলত বেশি হারে।

নতুন ল্যাবরেটরিতে লেখালিখির প্রচুর সময় পেলেন বনফুল। লিখতে আরম্ভ করলেন গদ্য পদ্য মিশ্রিত গল্প 'তৃণখণ্ড', আঙ্গিকের দিক থেকে পুরোপুরি উপন্যাস না হলেও এই লেখার মাধ্যমেই বনফুল উপনাসভূমিতে পা রাখেন। 'তৃণখণ্ড' 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন বনফুল, কিন্তু সম্পাদক পরিমল গোস্বামী তা ছাপতে রাজি হন না। তিনি লেখাটি ফেরত পাঠান। পরে সজনীকান্ত দাসের একান্ত উৎসাহে 'তৃণখণ্ড' সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। একই বছর সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয় বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস *বৈতরণী তীরে*। এরপর মূলত উপন্যাস লেখাতেই মন দেন বনফুল। লেখকের ভাষায়— এবার উপন্যাস লিখিবার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল।' (*পশ্চাৎপট/বনফুল/*১৩৮৫/পৃঃ ২৩৩)
বই প্রকাশের এই পর্বে প্রকাশিত হয় বনফুলের আরো দুটি বই। একটি কবিতার অন্যটি গল্পের। 'বনফুলের কবিতা' নামের কবিতা সংকলনে ছিল ৮৪টি কবিতা, 'বনফুলের গল্প' নামের গল্প সংকলনে ছিল ৩৪ টি গল্প। এই পর্বে লেখালিখিতে বনফুলের উৎসাহ ছিল প্রবল। লেখার উপযুক্ত সময় হিসাবে তিনি মধ্যরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। নির্জনতা ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য এই সময়কেই যথার্থ মনে করতেন। নিয়ম করে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতেন

তিনি। তারপর লেখালিখি চলত ভোর পর্যন্ত। এমনকি ল্যাবরেটরিতেও তিনি লেখার খাতাটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

একটি বিষয় খেয়াল করে দেখুন, বনফুল যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তখন উজ্জ্বলভাবে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত। সমকালের প্রায় সমস্ত লেখকদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। কখনো সেই যোগাযোগ ছিল ব্যক্তিগত স্তরে, কখনোবা রচনাকর্মের মাধ্যমে। ১৯৩৬-এর শেষ দিকে অথবা ৩৭-এ প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের পরিচয় ঘটে। বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থে এই পরিচয় পর্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এইরকম — কালীঘাটের মন্দিরে ***বলিপ্রথার*** বিরুদ্ধে অনশনে বসেন জনৈক রামচন্দ্র শর্মা। রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের উদ্যোগকে সংবর্ধিত করে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ছাপা হয় ১৩৪২ সনের অশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ চরিত্রের এই সামান্য বিষয়ে কলম চালনা বনফুলের পছন্দ হয়নি। তিনি ওই রবীন্দ্র-কবিতাকে কটাক্ষ করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। কবিতাটি ছাপা হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বার্ষিক দোল সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়েন এবং বনফুলের বিষয়ে উৎসাহিত হন। কবি চিঠি লিখে বনফুলকে শান্তিনিকেতনে আসতে অনুরোধ করেন। কবির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বনফুল সপরিবারে শান্তিনিকেতন যান। প্রথম পরিচয়ের সূত্র ছিল এইরকম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের মুগ্ধতাবোধ বনফুলকে আপ্লুত করে। তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'কিছুক্ষণ' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকেই। 'কিছুক্ষণ' বনফুলের লেখা চতুর্থ উপন্যাস।



বলিপ্রথা ঃ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যজ্ঞ-পূজাদিতে প্রাণীবধ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার বিরোধী ছিলেন।

বনফুলের বাড়িতে থিয়েটারচর্চা পরিবেশের কথা আগেই বলেছি। ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর একটা টান ছিল। সম্ভবত সেই টানই তাঁকে একসময় নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করে। ১৩৪৪ সনে 'ভারতবর্ষ পত্রিকার আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বনফুলের নাটক *রূপান্তর*। এটিই বনফুলের প্রথম প্রকাশিত নাটক।

বনফুলের যাবতীয় লেখালিখিই একান্তভাবে তাঁর মর্জি নিয়ন্ত্রিত। খেয়ালখুশি মতো যখন যা ইচ্ছে হয়েছে তাই লিখেছেন বনফুল। তেমনই একটি রচনা জীবনীনাট্য 'শ্রীমধুসূদন'। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে বাংলার অবৈতনিক শিক্ষক হিসাপে কিছুদিন কাজ করেছিলেন বনফুল। সে সময়কার পাঠ্যক্রমভুক্ত মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* পড়াতেন তিনি। পড়াতে পড়াতে মধুসূদনের অন্তরঙ্গ জীবনকথার অভাব অনুভব করে বনফুল কবির জীবন আধারিত নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। লেখেন *শ্রীমধুসূদন* নাটকটি। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ১৩৪৫ সনের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই নাটক।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৬ ঃ বনফুলের স্ত্রীর নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ১৯২৭ থেকে '৩৩ লেখালিখিতে অন্তবর্তী বিরতির পর কার উৎসাহে বনফুল ফের কলম তুলে নেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ 'বনফুলের গল্প' নামের গল্প সংকলনে মোট কয়টি গল্প ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে কোথায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ বনফুল তাঁর কোন উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ মধুসূদন দত্তের জীবন-অবলম্বনে লেখা বনফুলের জীবনীটার নাম কী?

.....

বৈচিত্র্যপ্রিয়তা ছিল বনফুলের স্বভাবের অঙ্গ। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি লেখেন 'জঙ্গম' উপন্যাস। এটি বনফুলের সর্ববৃহৎ উপন্যাস। ১৩৪৬ সনের আষাঢ় থেকে ১৩৫৬ সনের কার্তিক মাস পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একটানা প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। ১৯৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলন এই দুই ঘটনা বনফুলকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, কবির ইচ্ছা ছিল বনফুলের কলমে নিজের জীবনের নাট্যরূপ দেখা। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে তিনি লেখেন একাঙ্ক নাটক 'অন্তরীক্ষে'। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শনিবারের চিঠির বিশেষ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৯৪৬) প্রকাশিত হয় নাটকটি। আর '৪২-এর আন্দোলনের প্রভাবে বনফুল লেখেন 'অগ্নি' নামের উপন্যাস।



আসুন জেনে নিই....

মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা ভাষার একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। ১৮৬৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কাব্য রচনা করেন। ধ্রুপদী মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনি পুনর্বিন্যস্ত করে মাইকেল এই সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের নায়ক রামচন্দ্র নন, রাবণ। মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে মধুসূদন এই কাব্যে রাবণকে বীর চরিত্র হিসাবে এবং রামচন্দ্রকে দেবতার কৃপাপ্রার্থী এক দুর্বল চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। কাব্যটি নয়টি সর্গে বিন্যস্ত। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে এই কাব্যের আরম্ভ ও মেঘনাদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারকর্মের বর্ণনায় কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে। মেঘনাদবধ মধুসূদনের সবচেয়ে উজ্জ্বল রচনা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন — 'ক্রিপস মিশন' ব্যর্থ হ'লে জাপানি আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের দাবি ওঠে। ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয়। ৭ আগস্ট নিখিল ভারত

কংগ্রস কমিটির বৈঠকে অহিংস গণ আন্দোলন চলাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধিজি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নীতি ঘোষণা করেন। ৮ আগষ্ট গভীর রাতে গান্ধিজি, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল, ভাঙচুর আরম্ভ হয়। আন্দোলন আর অহিংস থাকে না। আন্দোলনকারীদের রোষের মুখে রেলস্টেশন, ডাকঘর, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন পরিষেবা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চলতে থাকে দেশজুড়ে। আন্দোলন দমনে নির্বিচারে গুলি, লাঠি, গ্রেপ্তার, জরিমানা চলতে থাকে পুলিশি তৎপরতায়। এই আন্দোলনে প্রাণ হারান এক হাজারেরও বেশি মানুষ, বন্দি হন ষাট হাজার মানুষ। সরকারি দমননীতির ব্যাপকতায় ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন 'আগস্ট আন্দোলন' ও '৪২-এর আন্দোলন' নামেও পরিচিত।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা গ্রন্থে বনফুল সম্পর্কে বলেছেন— 'বনফুল মূলত জীবন সম্পর্কে অশ্রান্ত কৌতূহলী। তাঁর কৌতূহল জীবনের সকল ক্ষেত্রে— ইহলৌকিক, পরলৌকিক, বস্তুলোক, স্বপ্নলোক, বিজ্ঞানদর্শন, কাব্যইতিহাস, বাস্তব জীবন ও অন্তরলোক —সর্বত্রই তাঁর সমান কৌতূহল।' —এই কৌতূহলই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতূহলের রস' তবে বনফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত মৌলিক বিশেষণটি হল— 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'। —'জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলি-ধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখানোর কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক।' (বনফুল/রবীন্দ্রস্মৃতি/পৃঃ ৩৮)

বিচিত্ররকম বিষয়ে অদ্ভুত কৌতূহল বনফুলের লেখার সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আপনারা জানেন যে 'বনফুল' লেখকের ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামটিই যেন লেখকের পিতৃদত্ত নামকে আড়াল করে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো 'বনফুল' ছাড়াও লেখকের আরো কয়েকটি ছদ্মনাম ছিল। এমন দুটি ছদ্মনামের উল্লেখ রয়েছে পরিমল গোস্বামীর 'যখন সম্পাদক ছিলাম' শীর্ষক বইতে— বৃহন্নলা বসাক ও শ্রীবলভদ্র কথক।

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটকের পাশাপাশি বনফুল প্রবন্ধ রচনাতেও সমান উৎসাহী ছিলেন। 'মনন', 'শিক্ষার ভিত্তি', 'দ্বিজেন্দ্র দর্পণ', বনফুলের কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম। তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর পাঠকের অসংখ্য চিঠিপত্র পেতে আরম্ভ করেন তিনি। সেইসব চিঠিতে পাঠকের বিভিন্ন প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নের উত্তর চিঠির আকারে না লিখে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে আছম্ভ করেন বনফুল। ১৩৫৫ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'উত্তর' শিরোনামে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধগুলি। প্রবন্ধগুলির নাম থেকে লেখকের বৈচিত্র্যপ্রিয়তার আন্দাজ পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এখানে তুলে দেওয়া হল— 'ধর্ম', 'আর্ট', 'যন্ত্র-মহিমা', 'বেকার-সমস্যা', 'সিনেমা-প্রসংগ', 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি।

অনুবাদ সাহিত্যে বনফুলের অবদান কিছু কম নয়। পাশ্চাত্যের ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বনফুলের অনুবাদে ছয়টি উপন্যাস ও একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। বেন ট্রেডার্স-এর 'এ কাক্কু ইন দ্য নেস্ট' অবলম্বনে 'ভীমপলশ্রী', আনাতোল ফ্রাঁস-এর 'থেইস' অবলম্বনে 'নিরঞ্জনা', দস্তয়ভস্কির 'দ্য ইণ্টারনাল হাজব্যাণ্ড' অবলম্বনে 'নঞ-তৎপুরুষ', আর এল স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' অবলম্বনে 'গন্ধরাজ', চেকভের 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স' অবলম্বনে 'সীমারেখা', ডিকেন্সের 'ক্রিসমাস ক্যারল' অবলম্বনে 'পীতাম্বরের পুনর্জন্ম' এবং ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের 'পোয়েটেস্টার্স অফ ইস্পাহান' অবলম্বনে 'কবয়' বনফুলের অনুবাদকর্মের নিদর্শন। অনুবাদের নাম থেকেই স্পষ্ট যে কোনো অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ ছিল না। বিদেশী সাহিত্যের ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে রূপান্তর করেছিলেন বনফুল।

বনফুলের জীবনের শেষ দশ বছরের ঘটনাপ্রবাহে এবারে নজর দেওয়া যাক। দীর্ঘ ৩৮ বছর ভাগলপুরে বসবাসের পর ১৯৬৮ সালে বনফুল আবার কলকাতায় ফেরেন। ততদিনে ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজের টানে দূরে সরে গেছেন। ছেলেমেয়েদের অনুপস্থিতিতে পত্নী লীলাবতির জীবনে নিঃসঙ্গতা বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে ডাক্তারি ও সাহিত্যচর্চা একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া, সময়ের অভাবে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বনফুলের কাছে। ভাগলপুরে থাকলে রোগী দেখার হাত থেকে নিস্তার নেই জেনে বনফুল ভাগলপুর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে ডাক্তারি প্র্যাকটিশও ছাড়েন।

শেষ পর্বের লেখালিখির ভিতর বনফুলের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট' ও ডায়রি জাতীয় রচনা 'মর্জিমহল'।

প্রায় ৫০ বছর যৌথ জীবন যাপনের শেষে ১৯৭৫ সালে বনফুলের স্ত্রী লীলাবতি মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যু বনফুলের জীবন ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত শূন্যতা এনে দেয়। লীলাবতি ছিলেন বনফুলের সমস্ত রচনার প্রথম পাঠক ও সমালোচক। বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যে লীলাবতির জ্ঞান ছিল বিস্তৃত। অনুভূতিপরায়ণ লীলাবতির পরামর্শে বনফুল অনেক লেখার পরিবর্তন করেছেন বলে জানা যায়। তাছাড়া সংসার জীবনে বনফুল একান্তভাবেই ছিলেন লীলাবতির উপর নির্ভরশীল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিন বছর বেঁচেছিলেন বনফুল। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১২ ঃ বনফুলের লেখা সুবৃহৎ উপন্যাসটির নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বনফুল কোন নাটক লেখেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে কোন বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ 'বনফুল' ছাড়া বলাইচাঁদের আরো দুটি ছদ্মনাম লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ বনফুলের জন্ম ও মৃত্যুর সাল উল্লেখ করুন।

.....

৫.৪ জাগ্রত দেবতা

এক

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশেপাশে কচুবন, ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ, মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মকদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং অত বড় বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালেদের বাড়ির ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধরনা দিয়াই তাহার মা তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুকুজ্জেদের যে আজকাল এত বাড়-বাড়ন্ত, তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়! মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের কাছে মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটোখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণ মন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়াযায়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়া থাকেন,— শিব শিব হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুকুজ্জেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ি সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয় এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিন ঘটে, এইটাই মহাদেব-মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ— একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

দুই

সে বছরও বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুকুজ্জেদের বাড়িতে অভিনীত কর্ণার্জুন নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী-বাড়িতে যদিও পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সকলে পরিতৃপ্ত সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমক সহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এই সব লইয়া পালেদের ***চণ্ডীমণ্ডপে*** আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল,



চণ্ডীমণ্ডপ ঃ ঠাকুরদালান, যেখানে দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য পূজা হয়। গ্রামের বিভিন্ন সভা, বৈঠক এখানেই হয়ে থাকে।

ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয়নি !

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার। হরেন বলিল, কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?

যাদব বলিল, দেখে এলাম, ঠিক আছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল, বিশেই এবার মহাদেবের নাম রক্ষা করিবে। সেও ঠিক আছে।

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণ নীরবে আমাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এ হতে পারে না। ভাল করে খুঁজে দেখ, কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।

যাদব বলিল, এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।

নীলমণি বলিলেন, হতে পারে না।

যাদব হাসিয়া বলিল, আমি বলছি, কেউ পাগল হয়নি এবার।

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

তুমি তো সেদিনকার ছোড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কি? তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাব? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি।

যাদব স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল।

তিনি

পরদিনও কোন পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এবছর কেহ পাগল হয় নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন, এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন তো শিবকে কেউ পোঁছেও না, শিবের মাথায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আর কত সহিবেন। মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে ইহা আর কিছুই নয়, কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না? সনাতনপুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোন মহাদেব হইলে কোন্ কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ধনী মুকুজ্জেরা দায়ী করিলেন পুরোহিতকে— ওই ব্যাটাই কিছু গোলমাল করিয়াছে। পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নামহীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

চাব

দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস কেহ না কেহ নিশ্চয় পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের ***মাহাত্ম্য*** নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।



মাহাত্ম্য **ঃ** শব্দটির অর্থ— মহিমা, গৌরব, গুরুত্ব ইত্যাদি।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

৫.৪.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

সনাতনপুরের মহাদেব মন্দিরের দেবতা বড় জাগ্রত— একথা সে তল্লাটের মানুষমাত্র বিশ্বাসে সত্য বলে জানে। মন্দিরটি জরাজীর্ণ ও অবহেলিত হলেও ওই অঞ্চলের সমস্ত শুভকর্ম মহাদেবের কৃপাতেই ঘটে বলে জনতার বিশ্বাস। অঞ্চলের কারো মামলা নিস্পত্তি, রোগমুক্তি, লটারিপ্রাপ্তিকে মহাদেবের আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করে বাসিন্দারা। 'জাগ্রত' মহাদেবের মন্দিরে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় বড়সড় উৎসবের আয়োজন হয়। লোকবিশ্বাস মতে প্রতি বছর ওই দিন কেউ না কেউ পাগল হয়ে যান। পাগল ভোলানাথ প্রতি বছর একজনকে পাগল করে দলে টেনে নেন। গ্রামবাসীরা সাক্ষ্য দেন যে এমনটাই নিয়ম করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সনাতনপুর মন্দিরের মহাদেব জাগ্রত আছেন— এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

গল্পে সে বছর বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব সাড়ম্বরেই পালিত হয়। মেলা, যাত্রাগান, খাওয়াদাওয়া, ভক্তসমাগম অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো ভাবেই পার হয়। কিন্তু হঠাৎই একজন এসে খবর দেয় যে, সেই বৈশাখী পূর্ণিমায় কেউ পাগল হয়নি। গ্রামের লোক প্রথমে সে-সংবাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে এমনটা অসম্ভব। ধীরে ধীরে তাঁরা সংবাদের সত্যতা মেনে নেন বটে কিন্তু বিভিন্ন সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কেউ পুরোহিতকে দোষারোপ করেন তো কেউ দায়ি করেন বছরভর মহাদেবের প্রতি গ্রামবাসীর ঔদাসীন্যকে। একমাত্র গ্রামের বয়স্ক অধিবাসী নীলমণি কিছুতেই এই সংবাদের সত্যতা মেনে নিতে পারেন না। তিনি মনে করেন জাগ্রত মহাদেব থাকতে এমন ঘটনা কখনো সম্ভব নয়। গল্পের শেষে দেখা যায় প্রবীণ নীলমণি প্রচণ্ড রোদে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চোখ লাল, নিঃশ্বাস সঘন। তিনি এবাড়ি সেবাড়ি পাগল খুঁজে চলেছেন। নীলমণি নিজেই পাগল হয়েছেন জেনে সনাতনপুরের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, মহাদেব এখনও জাগ্রত আছেন।

৫.৪.২ গল্প-বিশ্লেষণ

আপনারা নিশ্চই লক্ষ করেছেন, বনফুলের গল্প আয়তনে খুবই ছোট। আয়তনের দিকটিকে মাথায় রেখে কোনো কোনো আলোচক বনফুলের গল্পগুলিকে 'অনুগল্প'

বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। ছোট পরিসরে টুকরো টুকরো ঘটনার বর্ণনায় বনফুল তাঁর গল্পগুলিকে নির্মাণ করেন। বর্ণনার টুকরো ঘটনাগুলিকে পাঠক তাঁর নিজের মতো করে জোড়া লাগিয়ে গল্পটি বের করে আনেন। গল্পের শেষ কথা লেখক এখানে কখনোই বলেন না। পাঠক তাঁর নিজের মতো করে গল্পটিকে সাজিয়ে নেন।

এই গল্পের নাম 'জাগ্রত দেবতা'। সত্যিই কি দেবতা জাগ্রত? অসুন গল্পের বর্ণনাগুলিকে জোড়া লাগিয়ে এর একটা মীমাংসাসূত্র বের করার চেষ্টা করা যাক। মহাদেব জাগ্রত— এটা গ্রামবাসীর বিশ্বাস। 'বিশ্বাস' এমন একটি ধারণা যাকে যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে এই বিশ্বাসের পেছনে যে কয়টি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে একবার নজর দেওয়া যাক। —এক, জনৈক বিপিন চৌধুরী মহাদেবের কাছে ***মানত*** করে মামলা জিতেছেন। দুই, পালেদের ছেলের রোগমুক্তি ঘটেছে। তিন, মুখুজ্জেদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। চার, হরিহর ঘোষাল লটারি পেয়েছেন। —এবারে খেয়াল করুন মামলাটি আইনত বিপিনবাবুরই জেতার কথা কি না অথবা বিপিনবাবু মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করে মামলা জিতেছেন কি না, তা আমাদের অজানা। পালেদের ছেলের রোগের নিরাময় সম্ভাবনা ও চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই। মুখুজ্জেদের বাড়বাড়ন্ত তাঁদের উদ্যমে কি না, সে প্রশ্ন অমীমাংসিত আর লটারিতে কেউ না কেউ পুরস্কার পাবেনই, ঘোষাল মহাদেবের কৃপাতেই পুরস্কৃত হয়েছে স্থির করে বলা যাচ্ছে কই ! —এই 'প্রমাণ'গুলিকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করলাম, খেয়াল করে দেখুন গ্রামবাসীদের মনেও একই অনিশ্চয়তাগুলি কাজ করার কথা। করে না তার কারণ, বিশ্বাস প্রমাণ-নির্ভর নয়। বিশ্বাসী মন যেকোনো ঘটনাকেই তার বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরতে চায়।

সনাতনপুরবাসীর কাছে মহাদেব জাগ্রত থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতি বছর একজন পাগল হয়ে যাবার ঘটনা। প্রথমেই খট্‌কা লাগে ঈশ্বর তাঁর ভক্তের মস্তিষ্ক বিকার ঘটাবেন কেন! তাঁরতো ভক্তের মানসিক প্রশান্তি দান করারই কথা। গ্রামবাসীরা জাগ্রত দেবতার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে যুক্তি খাড়া করেছেন যে, পাগল ভোলানাথ প্রতি বছর কাউকে না কাউকে পাগল করে দলে টানেন। লক্ষ করে দেখবেন যেকোনো ঈশ্বরিক শক্তির ধারণার পিছনে কোনো না কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা লুকনো থাকে। পূজো না করলে ভগবান রুষ্ট হন, ভক্তের ক্ষতি সাধন করেন। যেখানে ভয় সেখানেই ভক্তি।

প্রতি বছর একজন পাগল হয়ে যাওয়া সত্যিই কি মহাদেবের জাগ্রত থাকার মস্তবড় প্রমাণ? যেকোনো রোগের মতো মানসিক ভারসাম্য হারানোও একটা রোগ। সনাতনপুরের শিব মন্দিরে আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে ভক্ত সমাগম হয় বলে লেখক জানিয়েছেন। সনাতনপুর ও তার আশাপাশের গ্রাম মিলিয়ে যে বিরাট জনসংখ্যা, তার একজন মানসিক ভারসাম্যহীনতা হারানোর রোগে আক্রান্ত হওয়াটা কিন্তু মোটেই



মানত ঃ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে দেবতার কৃপা লাভের জন্য অঙ্গীকার। মানসিক, কার্যসিদ্ধি হলে সেই অঙ্গীকার পালন করাটাই দস্তুর।



অলৌকিক ঃ ইহলোকের ঘটনাবলির সঙ্গে সঙ্গতিহীন ঘটনা। যুক্তি-বুদ্ধিতে যে ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এই স্বাভাবিক ঘটনাটিকেই ***অলৌকিক***ত্বে প্রতিষ্ঠা করে মানুষ, তার বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি খোঁজার তাগিদে।

প্রত্যাশার চাপ অত্যন্ত বেশি হয়ে গেলে আশাভঙ্গে মানুষ কখনো কখনো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ভেবে দেখুন জাগ্রত দেবতার বিশ্বাসে সীমাহীন আস্থাই কি নীলমণির মস্তিষ্ক বিকারের একমাত্র কারণ নয়? যে মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল যে, কেউ পাগল হননি, অন্যান্য গ্রামবাসীরা কিন্তু ঘটনাটিকে মেনে নিয়ে তার কারণ হিসাবে বিভিন্ন যুক্তির সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছেন। ঘটনাটির সত্যতা মানতে পারেননি একমাত্র নীলমণি। কারণ জাগ্রত দেবতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। যা কার্যত অন্ধবিশ্বাস। সেই বিশ্বাসভঙ্গের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি পাগল হয়ে যান। বেদনার কৌতুক এটাই যে ঘটনার পরের বছর নীলমণির উদাহরণ মহাদেবের জাগ্রত থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবেই গৃহীত হবে। ঘটনার পূর্ববর্তী বছরগুলির উদাহরণগুলি লেখক আমাদের জানাননি। তাই তার বিশ্লেষণও সম্ভব নয়। কার্যত অন্ধবিশ্বাস কখনো তার বিশ্বস্ততার প্রমাণগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়ও না।

এখন প্রশ্ন হল লেখক কি সত্যিই এই গল্পে দেবতাকে জাগ্রত দেখাতে চেয়েছেন? না কি 'জাগ্রত দেবতা' নামটি ব্যঙ্গাত্মক? —বনফুল রবীন্দ্রনাথের বিশেষণে 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'। তিনি ভীষণভাবে যুক্তিপ্রবণ। বনফুলের পেশা ডাক্তারি। তিনি খুব ভালো করেই জানন যে পাগলামি আর দশটা রোগের মতো একটা রোগ। আবার আগের অধ্যায়ে আপনারা জেনেছেন যে সেকালে ব্যাঙ্গরচনার বাহুল্যে দৃষ্টি আকর্ষণকারী পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'-র অন্যতম লেখক ছিলেন বনফুল। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ-গল্পের নাম বনফুলের ব্যঙ্গপ্রবণতারই দৃষ্টান্ত। 'জাগ্রত দেবতা' নামকরণের মাধ্যমে বনফুল অন্ধবিশ্বাস নামক সামাজিক ব্যাধিটিকেই আঘাত করতে চেয়েছেন।

চরিত্রচিত্রন ও ঘটনা বর্ণনা এ-গল্পে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলমের সামান্য আঁচড়ে তিনি চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে এনে হজির করান। যত চরিত্র এইগল্পে এসেছে তাদের কেউই লেখকের অনাদর পায়নি। বিশেষ করে নীলমণি চরিত্রের বর্ণনায় লেখকের চরিত্রনির্মাণ পারদর্শিতা যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। অথচ চরিত্রটিকে ***চাক্ষুস*** করে তুলতে বনফুল পাঁচ-ছয়টি মাত্র বাক্য ব্যবহার করেছেন। বাংলা ছোটগল্পে এই পরিমিতিবোধে বনফুলের নাম অগ্রগণ্য। অসুন নীলমণির বর্ণনায় শেষ কয়েকটি লাইন আর একবার পাঠ করি— 'প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। সনাতনপুরবাসীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।'



চাক্ষুস ঃ প্রত্যক্ষ, চোখে দেখা যায় এমন।



আসুন জেনে নিই ঃ শব্দার্থ

আবালবৃদ্ধবণিতা ঃ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই।

জীর্ণঃ পুরনো, মলিন।

চণ্ডীমণ্ডপ ঃ ঠাকুরদালান, গ্রামের আলোচনা, সভা-সমিতির জায়গা।

গেঁজেল	ঃ	গাঁজাখোর।
মাতব্বর	ঃ	নেতা।
নিষ্প্রভ	ঃ	অনুজ্জ্বল।
দ্বিপ্রহর	ঃ	দুপুরবেলা।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ জাগ্রত দেবতা-র মন্দির কোন গ্রামে ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ জাগ্রত দেবতাকে কেন্দ্র করে বছরে কোন দিন উৎসবের আয়োজন হয়?

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ মুকুজ্জেদের বাড়িতে কোন যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ উৎসবের দিন কার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২১ ঃ গল্পের বছর গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কেন?

.....

প্রশ্ন নং ২২ ঃ গল্পে শেষ পর্যন্ত কে পাগল হন?

.....

প্রশ্ন নং ২৩ ঃ ভরদুপুরে কে পাগল খুঁজতে বের হয়েছিলেন?

.....



৫.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- বনফুলের ছেলেবেলা ও শিক্ষাগ্রহণ পর্বগুলির বিষয়ে।

- বনফুলের ছদ্মনাম গ্রহণের তথ্য।
- কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেও ধীরে ধীরে গল্পকার তথা ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন বনফুল।
- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের পরিচয় পর্বের কথা।
- 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটি অন্ধসংস্কারের বিপক্ষে একটি সাহিত্যিক প্রতিবাদ।
- গল্পটিতে আছে কুসংস্কারের প্রতি ব্যঙ্গ ও স্বল্প আঁচড়ে চরিত্র নির্মাণ।
- গল্পটির নামকরণই ব্যঞ্জনাময়।



৫.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) গোস্বামী, পরিমল; *আমি যাঁদের দেখেছি।*

২) নন্দী, ঊর্মি ; *বনফুল ঃ জীবন মন ও সাহিত্য।*

৩) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ; *বনফুলের জীবন ও সাহিত্য।*



৫.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তারি।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিকাশ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বটুকদা।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'চোখ গেল', 'প্রবাসী'।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ লীলাবতি।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পরিমল গোস্বামী।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ৩৪ টি।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শান্তিনিকেতনে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'কিছুক্ষণ'।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'শ্রীমধুসূদন'।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'জঙ্গম'।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'অন্তরীক্ষে'।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৃহন্নলা বসাক, বলভদ্র কথক।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৯, মৃত্যু ঃ ১৯৭৯।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সনাতনপুর।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈশাখী পূর্ণিমা।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কর্ণার্জুন।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চৌধুরীদের বাড়ি।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সেবছর কেউ পাগল হয়নি বলে।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নীলমণি।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নীলমণি।



৫.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ কেন ও কোন পরিস্থিতিতে বলাইচাঁদ ছদ্মনাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন— বনফুলের জীবনী অবলম্বনে সবিস্তারে লিখুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ২ ঃ বনফুলের গল্পলেখক হয়ে ওঠার নেপথ্য কথা সবিস্তারে লিখুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৩ ঃ বনফুলের জীবনকথা বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৪ ঃ শৈশব ও কৈশোরের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সাহিত্যিক বনফুলকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল আলোচনা করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৫ ঃ বনফুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৬ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিখুন। (অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৭ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্প অবলম্বনে নীলমণি চরিত্রটি পরিস্ফুট করুন। (অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৮ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না আলোচনা করুন। (অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে)।

*** ***** ***